জাতীয় অর্থনীতিতে ইলিশের গুরুত্ব

মোঃ মামুন হাসান

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, প্রাণিজ পুষ্টির চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্যমোচনে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরে গুরুত্ব অপরিসীম। অভ্যন্তরীণ মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয় এবং সামুদ্রিক জলাশয়ের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। জাতীয় জিডিপিতে মৎস্যখাতের অবদান ২.৪৫ শতাংশ আর কৃষিজ জিডিপিতে মৎস্যখাতের অবদান ২১.৬৮ শতাংশ (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪) । রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক আয়ের এক শতাংশ অর্জন করছে। নদী, বিল, হাওরসহ শত শত জলাশয়ের পাশাপাশি সামুদ্রিক মাছ আহরণের সাথে জড়িয়ে আছে কয়েক লাখ মানুষ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষিবিষয়ক সংস্থা (এফএও) বিশ্বের মৎস্যসম্পদবিষয়ক প্রতিবেদন 'ওয়ার্ল্ড স্টেট অব ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার-২০২৪-এর তথ্য মতে, মিঠা পানির মাছ আহরণে বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয়, চাষের মাছ উৎপাদনে বিশ্বে পঞ্চম এবং ইলিশ আহরণে প্রথম। ২০১৭ সালের ১৭ আগস্ট দেশের ইলিশ মাছ ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়, যা বাংলাদেশের জনা গৌরবের বিষয়।

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ এবং নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। ইলিশের টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধিতে ২০০৪ সালে হিলশা ফিশারিজ ম্যানেজম্যান্ট অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করা হয় এবং তদনুযায়ী সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ইলিশের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ (প্রায় ১২%) এবং জিডিপিতে অবদান এক শতাংশ। বিশ্বের মোট উৎপাদিত ইলিশের ৮০ শতাংশের বেশি আহরিত হয় এ দেশের নদ-নদী থেকে। শুধু তাই নয় উপকূলীয় জেলে, মৎস্যজীবী সম্প্রদায় এবং উপকূলবাসীদের জীবনজীবিকা নির্বাহে ইলিশের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রায় ৬লক্ষ মানুষ ইলিশ আহরণে সরাসরি নিয়োজিত এবং ২০-২৫ লক্ষ মানুষ ইলিশ পরিবহণ, বিক্রয়, জাল ও নৌকা তৈরি, বরফ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণসহ ইত্যাদি কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত।

ইলিশ মাছ প্রজননের ক্ষেত্রে চন্দ্রনির্ভর আবর্তন অনুসরণ করে। প্রতিবছর আশ্বিন মাসের প্রথম উদিত চাঁদের পূর্ণিমার আগের চার দিন, পরের ১৭ দিন এবং পূর্ণিমার দিনসহ মোট ২২ দিন এ নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে। ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ১১ দিন, ২০১৫ সালে ১৫ দিন নিষেধাজ্ঞা জারি থাকলেও ২০১৭ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়িয়ে ২২ দিন করা হয়। ইলিশ মূলত সারা বছর কম-বেশি ডিম ছাড়লেও সেপ্টেম্বর অক্টোবর হচ্ছে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম। এ সময়েই প্রায় ৮০ শতাংশ ইলিশ ডিম ছাড়ে। তবে মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য মতে ২০২৩ সালে অভিযান পরিচালনার ফলে মা ইলিশ ৮৪.১ শতাংশ ডিম ছেড়েছে আর এবছর এখনও গবেষণা চলছে। মা ইলিশ বলতে প্রজননক্ষম পরিক্ব স্ত্রী ইলিশ মাছ বোঝায়।

ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে প্রজনন নির্বিঘ্ন করার স্বার্থে এবং জাটকা রক্ষায় ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিদ্যমান ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রমের মোট দৈর্ঘ্য ৪৩২ কি.মি.যা ৬টি জেলার ২৪টি উপজেলাব্যাপী বিস্তৃত। ইলিশ অভয়াশ্রমের এলাকাগুলো হলো: চাঁদপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, শরীয়তপুর, বরিশাল, মেহেন্দীগঞ্জ। ইলিশের প্রজনন ক্ষেত্রের চারটি পয়েন্ট চট্টগ্রামের মীরসরাই উপজেলার মায়ানি, ভোলার তজুমুদ্দিন ও ভোলার পশ্চিমে সৈয়দ আওলিয়া, কক্সবাজারের কুতুবদিয়া ও উত্তর কুতুবদিয়া এবং পটুয়াখালীর কলাপাড়া ও লতাচাপালী চিহ্নিত করা হয়েছে। যা প্রায় সাত হাজার কি:মি: উপকূলীয় এলাকা জুড়ে বিস্তৃত।

ইলিশ মাছের প্রধান প্রজনন মৌসুমে নিরাপদে ডিম ছাড়ার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এবছর ১৩ অক্টোবর হতে ০৩ নভেম্বর ২০২৪ (২৮ আশ্বিন হতে ১৮ কার্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ) পর্যন্ত মোট ২২ দিন সারাদেশে ইলিশ মাছ আহরণ, পরিবহণ, মজুদ, বাজারজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। দেশে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিকে সর্বসাধারণ, বিশেষ করে জেলে, মৎস্যজীবী সম্প্রদায় ও ইলিশের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যবসয়ি, আড়তদার, বরফকল মালিক, দাদনদার ও ভোক্তাসহ সবাইকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করাই উদ্দেশ্য। ২০২৪ সালে প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ সংরক্ষণ এলাকা হিসেবে অভিযানে ৩৮টি জেলার ১৭৮টি উপজেলাকে নির্ধারণ করা হয়।

'মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৪' এর আওতায় মোট ২ হাজার ১৬৫টি মোবাইল কোর্ট ও ৯ হাজার ৮০২টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এ সকল মোবাইল কোর্ট ও অভিযানের মাধ্যমে ৫৪.৮৪ মে.টন ইলিশ জব্দ, ৬১১.৬৩৮ লক্ষ মিটার জাল আটক, ৩ হাজার ২৫টি মামলা দায়ের, ৭৫.২৭৩ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় এবং ২ হাজার ৯ জনকে জেল প্রদান করা হয়েছে। অভিযান

চলাকালীন জেলেদের জন্য মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য এবছর মোট ১৪১৬৪.১২৫ মে.টন চাল ৫৬৬৫৬৫টি জেলে পরিবারের মাঝে বরাদ্দ করা হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টার নির্দেশে ভবিষ্যতে ভিজিএফ এর পরিমাণ ও সুফলভোগীর সংখ্যা ১০% বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আগামীতে ৪০ কেজি মাসিক ভিজিএফ এর পরিবর্তে ৫০ কেজি এবং ২৫ কেজি এর পরিবর্তে ৪০ কেজি চাল বরাদ্দ দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং সকল জেলে যাতে সরকারের সুবিধা পেতে পারে তার জন্য জেলেদের তালিকা হালনাগাদ করার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় নির্দেশনা দিয়েছে। এবারের মা ইলিশ রক্ষার অভিযান সফল হয়েছে এবং ইলিশের ডিম ছাড়ার হার ছিল গড়ে ৫৪ শতাংশ, কোথাও ৭০ শতাংশ এর বেশি হয়েছে। **ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায়** বিগত তিন মাসের (আগস্ট- অক্টোবর/২০২৪) মাসে ১,৪২৪টি ইলিশ আহরণকারী জেলে পরিবারের মাঝে ১,৪২৪টি বিকল্প আয়ের উপকরণ বিতরণ এবং ১,৮২৫ জন সুফলভোগী ইলিশ জেলেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ করেছে এবং এর সময়সীমা ও মাছের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। মৎস্য সংরক্ষণ আইন-১৯৫০ অনুযায়ী ১ নভেম্বর থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ১০ ইঞ্চির ছোট জাটকা ধরা নিষিদ্ধ থাকে। জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত মোট ৪ মাস প্রদান করা হয়। ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে প্রতিবছরে সরকার বরাদ্দ দিয়ে যাচ্ছে। এ বছর ২০টি জেলার ৯৭টি উপজেলায় ৩ লক্ষ ৬১ হাজার ৭১টি পরিবারের মধ্যে ৪০ কেজি হারে ২৮ হাজার ৮৮৫ মে.টন চাল ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা ফলাফল বলছে, ১০ বছর আগে দেশের ২১টি উপজেলার নদ- নদীতে ইলিশ পাওয়া যেত। বর্তমানে ৭টি বিভাগের ৩৮টি জেলার ১৭৮টি উপজেলার আশপাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীতে এ মাছ পাওয়া যাচ্ছে। গবেষকরা জানিয়েছেন, একটি ইলিশ একসঙ্গে কমপক্ষে ৩ লাখ ও সর্বোচ্চ ২১ লাখ ডিম ছাড়ে। এসব ডিমের ৭০- ৮০ শতাংশ ফুটে রেণু ইলিশ হয়। এর সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে, যা পরবর্তী সময়ে ইলিশে রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের তথ্যমতে বাজারে বড়ো আকারের ইলিশের প্রাপ্যতা (৮০০-৯০০গ্রাম) আগের তুলনায় ২৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। ইলিশের সর্বোচ্চ সহনশীল উৎপাদন ৭.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ যার উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে সঠিক ব্যবস্থাপনার ওপর। জাটকা ধরা বন্ধসহ প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশকে পরিপূর্ণ ডিম ছাড়তে দিলে ইলিশের উৎপাদন কয়েক গুণ বাড়বে বলে বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে। স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে আমরা নদীতে কোথায় মা ইলিশ বা জাটকা আহরণ করা হচ্ছে তা সণাক্ত করা সহজতর হবে এবং তৎক্ষণাৎ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে। এছাড়াও মাইক্রো বা ন্যানো চিপ টেকনোলজি ব্যবহার করে ইলিশ অভিপ্রয়াণপথ নিরূপণ করা যাবে। সুতরাং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণ করে দেশের ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হবে।

সহনশীল মাত্রায় ইলিশ উৎপাদনে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ রয়েছে এর মধ্যে আবাসস্থল ধ্বংস ও দূষণের কারণে ইলিশের অভিপ্রয়াণ পথ পরিবর্তন, অত্যধিক মাত্রায় জাটকা ও মা ইলিশ আহরণের ফলে পুনঃসংযোগ বা প্রবেশন প্রক্রিয়া ব্যাহত, নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণে অভিপ্রয়াণে বাধা, ইলিশ আহরণের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার জাল, নৌকা এবং নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর সংখ্যা নিরূপণ, দূষণের ফলে পানির গুণাগুণ পরিবর্তনজনিত কারণে অভয়াশ্রমসমূহের কার্যকারিতার প্রভাব নিরূপন এবং প্রজনন ক্ষেত্র সমূহের পরিবেশ ও প্রতিবেশগত কার্যকারিতা নিরূপণ এবং পুনঃনির্ধারণ অন্যতম। ফলে ইলিশ মাছের পরিভ্রমণ পথ, প্রজননক্ষেত্র, বিচরণ ও চারণক্ষেত্র (ফিডিং এবং নার্সারি গ্রাউন্ড) দিন দিন পরিবর্তিত ও বিনষ্টের কারণে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ইলিশের উৎপাদন হ্রাস পায়। এছাড়াও ক্রমাগত বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ, কর্মসংস্থানের অভাব, নির্বিচারে ক্ষতিকর জাল যেমন কারেন্ট জাল, বেহুন্দি জাল, বেড় জাল, চরঘেরা জাল, মশারি জাল, পাইজান, দুটাজাল ও অপরিকল্পিতভাবে যান্ত্রিক নৌযানের মাধ্যমে মাছ আহরণের উন্নত পদ্ধতি প্রবর্তন ইত্যাদি ইলিশ মাছের উৎপাদন হ্রাসের অন্যতম কারণ।

ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইলিশের আবাসস্থল উন্নয়ন ও অভিপ্রয়াণ পথ নির্ণয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, মাছের অভিপ্রয়াণ পথ সচল রাখতে নদী মাস্টার ড্রেজিংকরণ, ইলিশের অভিপ্রয়াণ পথের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সার্ভিলেন্স চেক পোস্ট স্থাপন অতীব জরুরি। এছাড়া ইলিশ আহরণের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার জাল, নৌকা ও আহরণের ওপর নির্ভরশীল জেলেদের তালিকা হাল নাগাদকরণ, স্থানীয় কমিউনিটি সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। বিদ্যমান অভয়াশ্রমে ইলিশের বিচরণ ও প্রজননক্ষেত্রে প্রজননের ওপর প্রতিবেশগত প্রভাব নিরূপণ ও পুনঃনির্ধারণে গবেষণা এবং আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ইলিশসম্পদ একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। ইলিশ উৎপাদনের এই ধারাবাহিকতা ও টেকসইকরণে বড় চ্যালেঞ্জ হলো মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করা ও জেলে সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন করে ইলিশ উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় তাদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা। চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই মৎস্য প্রজাতির উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসইকরণে সরকারের নানামুখী ইলিশ বান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। দেশের অর্থনীতির চাকা উন্নতির পথে ধাবমান রাখতে ইলিশ হতে পারে মোক্ষম পণ্য। সরকার এবং জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইলিশের উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করে সমস্যা সমাধানের পথ সুগম করবে বলে আশা করা যায়। আর সমাধানে ব্যর্থ হলে ভঙ্গুর হয়ে যাবে সমৃদ্ধি ও সম্ভাবনার অন্যতম খাত ইলিশ।

#

লেখক: সিনিয়র তথ্য অফিসার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

পিআইডি ফিচার